জঙ্গলের অশরীরি

বারিন্দ্র দে

এফ ই- ৩৯৮

আমাদের যৌথ পরিবারে বিশাল জায়গা সমেত বিরাট বাড়ি রয়েছে। সেখানে আমরা কখন সকলে গিয়ে থাকি, কয়েকটা দিন ছুটি কাটিয়ে মন ভাল করতে যাই। জায়গাটা অবশ্যই বাংলার বাইরে। শহরটা এককালে ব্রিটিশদের অধীনস্থ ছিল, তাই সিভিল লাইন নামে পরিচিত হ'তো কিছু রাস্তা। আর এই রাস্তাগুলো হ'তো শহর থেকে দূরে, যেখানে দেখা যেত বিরাট বিরাট বাংলো যেগুলো হতো ইংরেজ রাজ কর্মচারীদের আবাস। আমাদের বাড়িটাও ঠিক সেইরকম একটা বাংলো। সিভিল লাইনস নামক শহরের রাস্তার ওপর, যেটা নিরিবিলি নিঝুমস শহর থেকে দূরে। এছাড়া বাড়িটা ঘিরে অসংখ্য গাছ। লম্বা লম্বা নিম, তেঁতুল, আম, জাম, দেবদারু, পেয়ারা আরো কত কি। বাড়ির দুধারে পেছনে আর সামনে দু-দুটো কুয়ো, আর পেছন দিকে ছিল একটা তুলসী-মঞ্চ। যদিও ওই তুলসী মঞ্চে প্রদীপ দিতে দেখিনি কোনদিন। অতবড় বাগানে ছিল, নানান পাখি, বাঁদর, শেয়াল, বুনো খরগোশ ইত্যাদি জন্তু জানোয়ার। এই ছিল আমাদের আকর্ষণের জায়গা। যদিও এটা বাগান না বলে জঙ্গল বলাই শ্রেয়। ছুটিতে সে পুজোরই হোক বা অন্য কিছুতে, আমরা ওখানে জড়ো হতাম। শীতে সেখানে ভীষণ ঠান্ডা, আর গরমে ততোধিক গরম। শীতে আমরা গরম জলের বোতল নিয়ে বিছানায় শুতাম, আর গরমে ঘরের বাইরে লম্বা টানা বারান্দায় নেওয়ারে খাটিয়ায় শুতাম। আমার জন্ম এখানে। বাংলোটা দাদু কিনেছিলেন। পরিধি অনুযায়ী ১ লক্ষ স্কোয়ার ফিট, বাউণ্ডারী ওয়াল দিয়ে ঘেরা।

এইরকমই একবার, হায়ার সেকেণ্ডারি পরীক্ষা শেষ হওয়ায়, জীবনে প্রথমবার, আমার বাবা আমাকে ট্রেনে তুলে দিলেন, আমাদের সেই আনন্দের গন্তব্যে, একা। ওখানে তখন আমার মেজকাকা আর ঠাকুমা স্থায়ীভাবে আছেন। কাকা অকৃতদার। সুতরাং আমরা তিনজন ওই বিশাল বাংলোতে খুবই সংক্ষিপ্ত পরিবার। নির্ঝঞ্ঝাট। ভোর বেলা তো পৌঁছে গেলাম পরদিন। একটা সাইকেল রিক্সা নিয়ে নেমে পড়লাম। "দে ভিলা" আমাদের বাড়ি। ছোট্ট পরিস্কার শহর। যতবার যাই, ততবার নতুন লাগে। একেই বলে বোধহয় মাটির টান। সেদিন চানটান সেরে, সকালের জল খাবার খেয়ে, এয়ার গানটা নিয়ে জঙ্গলে চললাম। তখন ছোট বয়স। এয়ার গান দিয়ে পাখি মারার চেষ্টা করতাম। যদিও আজ পর্যন্ত কিছু মারাই সম্ভব হয়নি। গরম শুরু হয়ে গেছে। রাতের খাওয়া খেয়ে, শুতে গেলাম, ১০.০০টা হবে। যেমনটা বলেছিলাম, টানা লম্বা বারান্দায় নেওয়ারের খাটিয়ায়। বাইরে চাঁদের আলো। চতুর্দিকে জোনাকী জ্বলছে। কখন ঘুমিয়ে পড়েছি খেয়াল নেই। হঠাৎই ঘুম ভেঙে গেল। চর্তুদিক নিস্তব্ধ। দূরে শিয়াল ডাকছে। মাঝ রাত্তির হবে। নিচু স্বরে কারা যেন কথা বলছে। বেশীর ভাগ নারী কণ্ঠে। পুরুষ কণ্ঠও আছে। একটা সম্মিলিত আলাপচারিতা। কান খাড়া করে শুনতে লাগলাম।

যেন একটা নিমন্ত্রণ বাড়ির লোকজনের মৃদু গুঞ্জন। তারপরেই আবার সব চুপচাপ। আবার শোনা যায়, কাঁচের বাসনপত্রর ঠুং-ঠাং শব্দ। এরই মধ্যে কানে আসে বিদেশী সঙ্গীত ধ্বনি। আমি কিছুটা ভীত, হতভম্ব, উৎকর্ণ হয়ে শুনতে থাকি। এরই মধ্যে ধীরে ধীরে কখন ঘুমিয়ে পড়েছি, খেয়াল নেই।

ভোরবেলা ঘুম ভাঙল। মুখহাত ধুয়ে বাড়ির বাইরে এলাম। বাড়ির সামনেটা ধরে যে রাস্তাটা গেছে, সেটা ধরে হাঁটতে লাগলাম। নির্জন শান্ত চতুর্দিক। রাস্তার দুধারে বড় বড় লম্বা গাছ। এ গাছ থেকে ও গাছে লাফালাফি করছে বাঁদরের দল। কখন ক্বচিৎ চলে যায় একজন সাইকেল আরোহী। কখন চোখে পড়ে, একটা লাঠির ডগায় লাগান ঝাঁটা দিয়ে রাস্তা ঝাঁট দিচ্ছে একটি মেয়ে। আনমনে হাঁটতে হাঁটতে মনে পড়ে গেল, গতকাল মাঝরাতের স্বরধ্বনি। আমি কি স্বপ্ন দেখছিলাম? না, তখন রীতিমতো জেগে ছিলাম। এসব নিয়ে বাড়িতে আলোচনা করলে, হাসির পাত্র হতে পারি। বেশ খানিকটা হেঁটে বাড়ি ফিরলাম। আর এক দফা মুখ হাত ধুয়ে, খাবার টেবিলে বসলাম। ততক্ষণে

মেজকাকা বাজার করে ফিরে এসেছে। আমি একখানা গল্পর বই নিয়ে, বারান্দায় একটা চেয়ার নিয়ে বসলাম।

দেখতে দেখতে দুপুর গড়িয়ে সন্ধে নামল। তখন টেলিভিশন ছিল না। তাই রেডিও, গ্রামাফোন বই পড়া আর ঠাকুমা কিংবা কাকার সঙ্গে সাধারণ কথাবার্তা। দেখতে দেখতে রাত ১০টা বেজে গেল। শোবার সময় হয়ে গেল। আজ রাতে কিছু দেখতে বা শুনতে পাই কিনা ভাবতে ভাবতে শুয়ে পড়লাম।

ঘুমিয়েও পড়লাম। আবার মাঝ রাতে ঘুম ভেঙে গেল। বারান্দা থেকে নেমে পোর্টিকো, যেখান থেকে পায়ে চলা পথ, চলে গেছে গেটের দিকে। রাস্তার উল্টো দিকে হাঁটলে বাড়ির পেছন দিকে যাওয়া যায়। যে দিকটা জঙ্গল।

পরিষ্কার দেখলাম গাউন পরা একটা ছায়ামূর্তি জঙ্গলের দিক থকে পোর্টিকো পার হয়ে গেটের দিকে গিয়ে বন্ধ গেট দিয়ে বাইরে বেরিয়ে গেল। তার হাঁটাটা অনেকটা ভেসে চলার মতো। দৃশ্যটা দেখে বেশ ভয় পেয়ে গেলাম। আর ঘুম আসতে চায় না। বেশ কিছুক্ষণ পরে দেখি, সেই গাউন পরা মূর্তি যে রাস্তায় এসেছিল, সেই রাস্তায় ফিরে গেল। এবার আমার চোখ থেকে ঘুম মুছে গেল। অর্ধেক রাতটা না ঘুমিয়েই কেটে গেল। ভোরবেলা উঠে হাঁটতে বেরোলাম। ফিরে এসে সকালের খাবার খেতে টেবিলে বসে মেজকাকাকে বললাম কথাটা। কাকা শুনে বিশেষ মনোযোগ দিল না। বলল কি দেখতে কি দেখেছিস। যাইহোক এয়ার গান নিয়ে জঙ্গলটা সেদিন ঘুরে এলাম। বলা হয়নি আমাদের বাড়ির শেষ সীমানায় জমিটা খাদের আকার নিয়েছে। ওটা আমাদের জমির মধ্যে নয়। বর্ষায় জায়গাটা একটা ডোবার আকার নেয়। তৃতীয় দিন দুপুরে আমি স্টেশনে বাংলা খবরের কাগজ কিনতে গেলাম। ফেরার সময় একটা সাইকেল রিক্সায় উঠে, আমার গন্তব্য বোঝাতে কবরস্থান গাড্ডা? —বলল, রিক্সাওয়ালা বেশ বয়স্ক। আমি বিস্মিত হয়ে, আবার প্রশ্ন করি, গাড্ডার আগে যে মকান আর জঙ্গল, ওখানেই যাব। তখন সে বলে, জঙ্গলের পরেই কবরস্থান ছিল সাহেবদের। স্বাভাবিকভাবেই, খাদ সংলগ্ন জমি আমাদের নয়। তাই আমাদের জানার কথাও নয়। তবে দাদু হয়ত জানতেন। ভাবলাম কাকাকে জিজ্ঞেস করব। সন্ধেবেলা কাকা আসতে জিজ্ঞাসা করলাম। বললাম রিক্সাওয়ালার কথা। বহুকাল আগে খাদের ধারে একটা-দুটো ইংরেজদের কবর ছিল বোধহয়, বলল মেজ কাকা। ওটা আমাদের জমির আওতায় পড়ে না, বলল সে। সেই রাতে আমার বিশেষ কিছু অনুভূতি হয়নি।

পরদিন মাঝরাত্তিরে, আবার ঘুমটা ভেঙে গেল। শুয়ে শুয়ে শুনতে পাচ্ছি, মৃদু স্ত্রী-পুরুষের মিলিত কণ্ঠধ্বনি, ঠুং-ঠাং কাঁচের বাসনের শব্দ, সঙ্গে বিদেশী সঙ্গতের বেহালার মূর্ছনা। সবই আসছে বাড়ির পেছনের দিক থেকে। আমি বারান্দার বিছানা থেকে উঠে, সন্তর্পণে বাড়ির ভেতর দিয়ে রান্না ঘরের বন্ধ দরজার একটা ফাটলে চোখ রাখলাম। বাড়ির পেছনের যেদিকটা তুলসী মঞ্চ আর কুয়ো ঠিক সেইখানে। আমি অবাক হয়ে দেখলাম, ১০-১২ জনের একটি জমায়েত, নারী পুরুষ বালক বালিকা, উনিশ শতকের বিদেশী পোশাকে সজ্জিত। সকলেই বিদেশী, জ্বলছে সেজবাতি, একজন নারী গান গাইছে, একজন বেহালা বাদক বেহালা বাজাচ্ছে—বিদেশী সুর। তারই মধ্যে সকলে খাওয়া দাওয়া করছে। পানীয় গ্রহণ করছে। একটা মনোমুগ্ধকর সুন্দর পরিবেশ। যেন উনিশ শতকে ফিরে গেছি। কিম্বা দেখছি উনিশ শতকের কোন একটা সিনেমার দৃশ্য। এর মধ্যে মেজকাকা কখন পা টিপে টিপে আমার পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে, আর আমার পিঠে হাত রেখেছে। আর আমি ভয়ে ভীত হয়ে চমকে উঠেছি। তাতেই আমার মুখ থেকে বেরিয়েছে একটা ভয়ার্ত আর্তনাদ। দরজায় হয়েছে একটা আন্দোলনের শব্দ। ব্যাস তাতেই সব দৃশ্যপট অদৃশ্য। কাকা ফট করে আলোটা জ্বেলে দিল। কি দেখছিস? —বলল কাকা। আমি বলি দেখ। কাকা বলল, কই কিছু তো নেই। রান্না ঘরের দরজাটা খুলে দিল। চতুর্দিকে ঘুট-ঘুটে অন্ধকার, জোনাকি জ্বলছে, আর দূর থেকে ভেসে আসছে, শেয়ালের ডাক। কাকা বলল শুতে চল। কাকা জানতে চাইল কি দেখছিলাম? আমি আনুপূর্বিক সমস্ত বললাম। সব শুনে কাকা চুপ করে রইল।

পরদিন সকালে জলখাবার খেয়ে, গেলাম জঙ্গলের শেষ সীমানায়। বাউন্ডারি ওয়ালের ওপর উঠে, ভালো করে নিরীক্ষণ করলাম। কবর আকৃতির ঘাসে-গুল্মে ঢাকা ঢিবি কয়েকটা রয়েছে বটে। খাদের গায়ে। বাউন্ডারি ওয়ালের ওদিকে নামলাম। তারপর একটা বাঁশের কঞ্চি দিয়ে একটা ঢিবির ওপর থেকে লতা-গুল্ম সরিয়ে, ঘাস মাটি কঞ্চিটা দিয়ে খুঁড়ে ফেললাম। বেশ কিছুক্ষণ মাটি খোঁড়ার পর, একটা পাথরের বিবর্ণ অংশ চোখে পড়ল। একটা কিছু লেখা রয়েছে যেন। আরও খানিকটা মাটি সরাতে দেখলাম লেখা রয়েছে ''জেমস স্কট-১৯৩৩''। ওইটুকু দেখে, আবার মাটি চাপা দিয়ে, বাউন্ডারি ওয়ালের এপারে এসে বাড়ির পথ ধরলাম। জানি এ কথা কেউ বিশ্বাস করবে না। মেজ কাকা যখন করেনি। এরপর আরও কয়েকটা দিন ছিলাম, আর তেমন কিছু ঘটেনি।

‘‘খেলাঘর বাঁধতে লেগেছি মনের ভিতরে’’

ভারতী রায়
এফ ই- ২৮১

‘‘মেঘে মেঘে কি যেন বাজে
আগডুম বাগডুম ঘোড়াডুম সাজে।’’

এই যে ‘‘ছেলেবেলার খেলার রেস’’ কবির জীবনে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ভাবে প্রকাশ পেয়েছে। খেলা যে জীবনে নির্মল আনন্দ দেয় তার কোনও মূল্যায়ন হয় না। তাই তার ভাষাতে আমরা শুনতে পাই—

‘‘ছিন্ন পাতার সাজাই তরনী
একা একা করি খেলা’’

আজ আমি নয়ের দশকের দিকে এগুচ্ছি এখনও খেলার মাঠে গেলে আমি নবনীতার ছাপ পাই। তার ফলে মাঠে গিয়ে অংশ গ্রহণ করি। সেই অংশ গ্রহণ করাতে আমার কোনও মানসিক চঞ্চলতা হয় না। বরং আমি অনায়াসে সফল হই। তাতে অনেকেই আমার পারদর্শিতা নিয়ে প্রশ্ন করে।

শিশু জন্মগ্রহণ করে সহজাত প্রবৃত্তি নিয়ে। প্রতিটি মুহূর্ত জন্মের পর থেকে বিকশিত হতে থাকে। এই বিকাশের জন্য কোনোও শিক্ষনের সহায়তা লাগে না। হাত পা নেড়ে খেলা ? দেখতে আনন্দ হয়। এইভাবে একে একে প্রতিটি পদক্ষেপ আরম্ভ হয়। সে বসতে, হাঁটতে খেলতে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়। খেলা এমন একটি প্রবৃত্তি যা বিপুল আনন্দ উদ্দীপনা দেয়। উত্তরোত্তর বুদ্ধি, একাগ্রতা পর্য্যবেক্ষণ ক্ষমতা বিকশিত হয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে। তখন নানা ধরনের খেলার উপকরণ দিয়ে শিশুদের মনো বিকাশ করার ব্যবস্থা হয়, বিভিন্ন পথে চলতে থাকা ও পূর্ণতা পাওয়ার পথ সুগম হয়। ঘর থেকে পথ, পথ থেকে মাঠ তার বিকশিত হওয়ার পথ খুলে দেয় ও পূর্ণতা পেতে সাহায্য করে।

খেলাধূলা এমন একটা প্রবৃত্তি যা শরীর ও মন দুটোই সতেজ রাখে। মনের প্রসারতা ও শারীরিক উন্নতি একসঙ্গে হয়। আমি নিজে এ বিষয়ে খুবই উৎসাহী ছিলাম। কিন্তু সুযোগ সুবিধা সেভাবে ছিল না। মেয়েদের একটা নির্দিষ্ট সময় ছিল, তার পরে খেলাধূলার চর্চা করা কঠিন ছিল। আমি আমার সমবয়সীদের সঙ্গে খেলার অনেকটা সুযোগ সুবিধা পেয়েছিলাম। আমার ছেসেবেলা ডুয়ার্স শহর জলপাইগুড়ি, মামাবাড়ী ও নিজেদের বাড়ী ঢাকার অন্তর্গত মানিকগঞ্জে ছিল। বাড়ীগুলিতে উঠোন ও খেলার জন্য প্রচুর উন্মুক্ত জায়গা পেতাম। তাই দশ-এগারো বছর বয়স পর্যন্ত নানা ধরনের খেলা পেয়েছি ও করেছি। প্রতিদিন খেলার সুযোগ পেতাম। গোল্লাছুট, কানামাছি, হা ডু ডু, লুকোচুরি, দাড়িয়াবাধা খেলা ঋতু অনুযায়ী খেলা হত। এগুলো হত মাঠের মধ্যে নানাভাবে ও নানাসময়ে ।আবার ঘরের মধ্যে খেলার জন্য ক্যারাম, কড়িখেলা, বাঘবন্দী খেলা, লুডো খেলা সবই হত। একটু বড় হয়ে সাঁতার কাটা শেখার কোনও অসুবিধা হয়নি। বাড়ীর সংলগ্ন পুকুর ছিল। সেখানে জলে ভাসতে ভাসতে সাঁতারে পারদর্শী হয়ে পড়ি। এখনও সেই সাঁতার কাটতে কোনও অসুবিধা হয় না। একটু বড় হয়ে ব্যাটমিন্টন খেলতে শুরু করি। এই খেলাতে পারদর্শিতা লাভ করি। ক্রমে ক্রমে সব খেলা থেকে সরে আসি।

খেলার মাঠ এখনও আমাকে টানে, তাই খেলার মাঠ আমার ভাল লাগার বড় জায়গা।

ছেলেবেলায় খেলা নিয়ে আলোচনা উদ্দীপনা, তর্ক-বিতর্ক খুবই চলত। ফুটবল খেলা, পরে ক্রিকেট খেলার প্রভাব প্রায় সকলের উপর পড়ত। ফুটবল খেলার দুই পক্ষ মোহনবাগান ও ইষ্টবেঙ্গল। এই দুইদল পদ্মা নদীর এপার ও ওপার বাংলা নিয়ে প্রতিযোগিতা ছিল। এপার বাংলা ছিল মোহনবাগান তাই মোহনবাগান জিতলে বল হত চিংড়ি মাছ খুব দামী হবে। আর ইষ্টবেঙ্গল জিতলে বলা হত ইলিশ মাছ ঘরে ঘরে পৌঁছে যাবে।

ষাটের দশকে ক্রিকেট খেলা আমাদের জীবনে প্রচণ্ড প্রভাব ফেলে। দেখা গেল একদিকে নূতনভাবে প্রতিবেশী দুই দেশ প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে, আমরা আপামর জনতা এমন মেতে উঠতাম যে যার বাইরে নূতন স্পন্দন শুরু হত।

একদিকে নূতন পাকিস্তানের হানিফ অন্যদিকে ভারতের পতৌদি সবার ঘরের পুজোর মন্ত্র হয়ে গিয়েছিল। আমরা, বাবা মা, ঠাকুমা দিদিমারা একসুরে আনন্দে মেতে উঠতাম আবার পরাজিত হলে দুঃখে কাতর হতাম।

তখন রেডিও ঘরে ঘরে আসতে শুরু করেছে ও ধারাভাষ্য দেওয়া হত। সবাই একসঙ্গে বসে বাংলার ধারাভাষ্য শুনে যেত। একদিক থেকে অস্ট্রেলিয়ার, ইংল্যাণ্ডের নামী দামী খেলোয়াড় এসে ইডেনে অংশগ্রহণ করত ও আমরা মাঠে উপস্থিত হয়ে উপভোগ করতাম। অনেক ঠাকুমারা তাঁদের পুজোয় বসে প্রার্থনা করতেন যেন দেশের সুনাম হয়। ফলে নাম বিভ্রাট হত। অনেক খেলোয়াড় ভারতীয় হয়ে যেতেন অজয়বাবু ভাষ্যকার হিসাবে খুবই প্রিয় ছিলেন, তিনি বাংলায় বলতেন। বলার মধ্যে এমন একটা আবেগ থাকত, যাতে খেলোয়াড়দের প্রতি নানাভাবে শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা উপছে পড়ত। অনেক আবেগের আবার কমেডিও হত। যেমন তিনি প্রচণ্ড আবেগ দিয়ে পতৌদিকে বলছেন ''পতৌদি দেখতে যেমন ইংলিশ, বলনেও ইংলিশ আবার ব্যাট হাতেও ইংলিশ।'' তাকে মাঠে নামতে দেখলেই মন প্রাণ আনন্দে মেতে ওঠে। তিনি নামছেন কি সুন্দর তাঁর চলন ও ব্যাটিং ''বলতে বলতে তিনি আউট।'' এইভাবে সব হাসি হত। কিন্তু তবুও খেলোয়াড় চিরদিনই সম্মান পেয়েছেন।

এই যে জীবন পাওয়া যেত, আজ সে সব হারিয়ে গেছে। লকডাউন ও করোনা আমাদের সব আনন্দ বিলাসিতা কেড়ে নিয়ে এক আদিম গুহায় নিক্ষেপ করেছে। এদিন একদিন কাটবে। সংস্কৃতে একটা কথা আছে—''শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনম্।'' শরীরকে সুষ্ঠুভাবে গঠন করাই ধর্ম্মসাধন। খেলা শরীর গঠন করে, সুস্থ মানবসমাজ তৈরী করে। আমরা আশাবাদী, এই অতিমারীর আঁধারের ওপারে ওই বুঝি সুদিনের আলোকরশ্মি। খেলার মাঠ আবার উন্মাদ হয়ে উঠুক জয়ধ্বনির আনন্দ-গর্জনে।

''ফুল আপনার জন্যে ফুটে না,
পরের জন্য আপনার হৃদয়-কুসুমকে প্রস্ফুটিত করিও''

—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

২৩শে জানুয়ারী

লেঃ কর্নেল (ডাঃ) জ্যোতির্ময় চৌধুরী (অবসরপ্রাপ্ত)
এফ ই- ১৮৭

মনে রাখার মত দিন—নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর জন্মদিন। ভারতের শ্রেষ্ঠ সংগ্রামী নেতাজীর আবির্ভাব। তবে এই মহান যোদ্ধার যাত্রাপথ মসৃণ নয়—পদে পদে বাধা। বিরূপ প্রচার। তাও সব কিছু উপেক্ষা করেও ভারতবাসীর হৃদয়ে তিনি পাকাপাকিভাবে স্থান করে নিয়েছেন।

ভাবতে পারা যায় একটা পরাধীন ভারতবর্ষ প্রবল বিদেশী, ব্রিটিশ শাসন থেকে ভারতবাসীকে মুক্ত করতে নানা প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন হয়ে বিদেশেরে মাটিতে আজাদ হিন্দ গড়ে বিদেশ এবং স্বদেশের মাটিতে স্বাধীন ভারতের পতাকা উত্তোলন করেন। পৃথিবীর স্বাধীনতা সংগ্রামের এটি একটি জ্বলন্ত উদাহরণ। সারা পৃথিবী আজ শ্রদ্ধার সঙ্গে তাই স্মরণ করে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুকে।

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে জড়িত রয়েছে প্রচুর স্বাধীনতা সংগ্রামীদের আত্মত্যাগ।

২৩শে জানুয়ারী দেশের বিভিন্ন প্রান্তে নেতাজীর দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের অবদানের কথা স্মরণ করে ভারতবাসী।

দুঃখের বিষয় কংগ্রেস নেতৃত্ব কোনদিনই নেতাজীকে মেনে নেয়নি। উপেক্ষা, অসহযোগীতা করে গিয়েছেন সারাজীবন। অথচ আমাদের দেশের আমজনতা দলে দলে নেতাজীর ডাকে সাড়া দিয়ে আজাদ হিন্দ্ বাহিনীতে যোগ দিয়েছিল। স্বাধীন ভারতের জাতীয় পতাকা দেশের এবং বিদেশের মাটিতে উত্তোলন করেছে। জাতি, ধর্ম, ভাষার কোন ভেদাভেদ নেই এই আজাদ হিন্দ ফৌজে।

নেতাজীকে আমি খুব শ্রদ্ধা করি। দু-একটি ছোটখাট উদাহরণ দিই। সিঙ্গাপুরে নেতাজীর memorial-এ শ্রদ্ধা জানাই। খড়্গপুর স্কুলে ছাত্র থাকার সময় স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন করি। একটা সময় ছিল যখন আজাদ হিন্দ ফৌজের দক্ষিণ ভারতীয়রা দেশে ফিরে যাচ্ছেন। আমরা আমাদের সংগঠনের তরফ থেকে জল, কিছু কিছু খাবার নিয়ে যেতাম ওদের জন্য। নেতাজীর প্রতি ওদের যে কি দারুণ শ্রদ্ধা তা বোঝাবার ভাষা নেই। একদিন হঠাৎ প্রচার মাধ্যমে জানানো হলে যে কিছুক্ষণের মধ্যেই অন্য platform এ শরৎচন্দ্র বসু আসছেন কলকাতার উদ্দেশে। ক্রমে ক্রমে সেই বার্তা রটি গেল গ্রামে। এই platform এর আজাদ হিন্দ ফৌজের লোকেরা ঐ platform এ পৌঁছোলেন। ট্রেন এল ঐ শরৎবাবু দরজার সামনে দাঁড়িয়ে। আজাদ হিন্দ ফৌজের লোকেরা অভিভূত। শরৎবাবুর পায়ে মাথা ঠেকাতে লাগলেন।

নেতাজী ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা উপহার দিয়েছেন। তার বদলে আমরা কি পারি ?

১) লাল কেল্লার সামনে নেতাজীর এবং আজাদ হিন্দ ফৌজের মূর্তি। সামনে লেখা কদম কদম...

২) আন্দামানকে শহীদ এবং নিকোবরকে স্বরাজ নামকরণ-নেতাজীর স্বপ্ন ছিল।

৩) যে কটি মুষ্টিময় আজাদ হিন্দ ফৌজের সেনানীরা রয়েছেন তাদের pension দেওয়া।

৪) ২৩ শে জানুয়ারী দেশপ্রেম দিবস হিসেবে গণ্য করা।

বর্তমানে সরকারের কাছে নেতাজীর প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর প্রেক্ষিতে উপরোক্ত আবেদন পেশ করছি-আশা করি ব্যবস্থা হবে।

অলকা

কৃষ্ণ রাজেশ্বরী মিত্র
এফ ই-১৮৫

অলকা শোবার আগে খাটের মাথার দিকের জানলাটা বন্ধ করতে করতে একবার শিউলি গাছটা দেখে নিলেন। শরৎকালে বলতে গেলে বর্ষার শেষ দিক থেকেই ফুলে ভরে যেত গাছটা। সুন্দর মিষ্টি একটা গন্ধ হাওয়ার ঝাপ্টার সঙ্গে মাঝে মাঝেই ঘরে ঢুকে পড়ত। মনে মনে অলকা ভাবতেন মা আসার সময় এগিয়ে এল বলে। সুবিমল গাছপালা খুব ভালবাসতেন, তাঁর কাছ থেকেই গাছকে ভালবাসতে শিখেছিলেন অলকা। পঁয়তাল্লিশ বছর একসঙ্গে পথ চলেছেন দুজনে। একে অপরকে যেমন দিয়েছেন আবার নিয়েছেনও অনেক কিছু। দু বছর হল সুবিমল হাত ছাড়িয়ে এগিয়ে গেছেন, আছেন অলকা একা। তবে একা আর থাকতে হবে না, ছেলে এসেছে ব্যাঙ্গালোর থেকে এবার মা কে সে নিয়েই যাবে। অলকা অনেক বুঝিয়ে বলেছেন এই বাড়িতে একা হয়েও তাঁর একা লাগে না, বাড়ির গ্যারাজে থাকে দিলীপ আর আভা। তারা যথেষ্ট দেখাশোনা করে, আর বাড়ির পেছনে বাগান ভর্তি এত যে গাছপালা তাদের মধ্যে ব'সে থাকলে তো মনে মনে সুবিমলকেও পাশে পান অলকা। এই বাগানের কত গাছ সুবিমলের নিজের হাতে লাগান। প্রতিটি গাছকে তাদের শুরুরদিন থেকে চেনেন অলকা, এরাও তো তাঁর আপনজন। বোঝে না বাপ্পা। কিছু বুঝতে চায় না।

সুটকেস গোছান শেষ। ঠাকুরঘরের ঠাকুরেরাও একটা ব্যাগে এসে উঠেছেন। রাত পোয়ালেই কাল ফ্লাইট। আজ তাড়াতাড়ি রাতের খাওয়া সারা হয়ে গেছে। ফেরার কথা মাস ছয়েক পরে, এখন ছমাসকে বড় দীর্ঘ সময় মনে হয়। কি জানি কখন কি হয়, আর কি ফেরা হবে, স্বামী স্ত্রীতে মিলে গড়ে তোলা এই বাড়ি 'অবসর'এ। সেপ্টেম্বরের শেষে যদি ফেরা হয় তাহলে মা দুর্গার মুখটা এবারকার মত দেখতে পাওয়ার আশা আছে, আর যদি তার আগেই কিছু ঘটে যায়? একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে অলকার মুখ দিয়ে। ঘুমোতে যাওয়ার আগে আজ মনে কত যে চিন্তার আন্দোলন চলছে, নিজেই তাদের সঙ্গে তাল রাখতে পারছেন না অলকা। মনে হচ্ছে মনটা নিজের মনেই হাজার কথা বলে চলেছে। অলকা নীরব শ্রোতা। এইসময় বাপ্পা হঠাৎ 'মা-মা' বলে ডাকছে। অস্ফুটে তাঁকে আসছি বললেন অলকা, কিন্তু বাপ্পার তা শুনতে পাওয়ার কথা নয়, পেলও না। একবার শোবার খাট, আলমারী, ড্রেসিং টেবিল সকলের গায়ে হাত বুলিয়ে মনে মনে বললেন—''ভাল থাকিস''। ড্রেসিং টেবিলের আয়নায় একটা কালো টিপ রয়ে গেছে, থাক। আবার ফিরে আসা যদি ভাগ্যে থাকে, তখন না হয় ওটা পরা যাবে। ঘরের দেওয়ালগুলোও যেন আজ কিছু বলতে চাইছে। দেওয়ালে যে জায়গায় সুবিমলের ছবিটা লাগান ছিল সেখানে হাত রেখে অলকা বললেন—''কাল চলে যাচ্ছি!''

বাপ্পার জন্যেও মনটা খুবই কাঁদে অলকার। এক বছর হল বিয়েটা ভেঙ্গে গেছে। এই বেয়াল্লিশ তেতাল্লিশ বছরে এসে হঠাৎ একা হয়ে গেছে ছেলেটা। সন্তান না আসাই কি কারণ? কার দোষে কি হয়েছে এ ব্যাপারে বেশি মাথা ঘামাতে চান না অলকা। ছেলে বউয়ের দশ বছরের বিবাহিত জীবনে অলকারা বেশি দিন ওদের সঙ্গে কাটানোর সুযোগ পান নি। সফটওয়ার কোম্পানীতে চাকরী সূত্রে অল্প বয়স থেকেই বাপ্পা ব্যাঙ্গালোর-বাসী। দক্ষিণ ভারতীয় মৃদুলা মেনন কে নিজের পছন্দেই বিয়ে করেছিল। অলকা সুবিমল ওদের বাড়ি গিয়ে অতিথির মত থেকে এসেছেন কয়েকবার আর ওরাও যখন একসঙ্গে এসেছে অতিথি হয়েই থেকেছে। আদর আপ্যায়ন কোন পক্ষ থেকেই কম হয়নি, কিন্তু কখনো কাছাকাছি হওয়াও হয়নি। কেরেলাইট মৃদুলার সঙ্গে ভাষার ব্যবধানও হয়তো এর জন্যে কিছুটা দায়ী ছিল। যাইহোক এখন ছেলের কথা ভেবেই তার সঙ্গে থাকতে প্রবাসে পাড়ি দেওয়ার জন্যে শেষ পর্যন্ত নিজেকে রাজী করিয়েছেন অলকা। তবু মন খালি বলে তাঁর যাওয়ার থেকে 'অবসরে' যদি বাপ্পাই এসে থাকতে পারত তাহলে আরো কত ভাল

হত। এখন দিলীপ আর আভাই বন্ধ বাড়ির পাহারাদার হয়ে থাকবে। ছমাস পরে অলকা যদি ফিরতে পারেন তাহলে একরকম, আর বাপ্পা যদি সিদ্ধান্ত নেয় বাড়ি আর রাখবে না তাহলে আর এক রকম অবস্থা। আবার বাপ্পা—'মা-মা' বলে চীৎকার করছে, কি এমন হল যে এত চেঁচামিচি করছে।

জোর গলায়—'আসছি' বলে সাড়া দিয়ে ঘর থেকে বেরোতে অলকা, বাপ্পাই উদভ্রান্তের মত ঘরে ঢুকে এল, বলল—''মা কাল আমাদের যাওয়া হবে না''। অলকার বুকের ভেতর ধক করে উঠল। যাওয়া হবে না? কেন?। বাপ্পা নিজের মোবাইলটা বের করে অলকার হাত ধরে তাঁকে খাটে বসিয়ে মোবাইলটা চালিয়ে দিল। আজ রাত বারোটার পর থেকে সমস্ত উড়ান বন্ধ প্রধানমন্ত্রীর আদেশ। স্মার্ট ফোন ব্যবহার করেন না অলকা তবে কাগজ পড়ে টিভি দেখে তিনিও জানেন করোনা বলে চীন দেশ থেকে কি এক মহামারি এসেছে। তার জন্যে প্রধানমন্ত্রীর কথায় কাঁসর বাজান, প্রদীপ দেওয়াও করেছিলেন অলকা। তাও আটকান গেল না! বাপ্পার মাথায় হাত পড়েছ। ব্যাঙ্গালোরে তার অফিস গুরুত্বপূর্ণ পোস্ট, ঠিক দিনে কাজে জয়েন করতে না পারলে কোম্পানী কি রাখবে? মৃদুলার সঙ্গে সম্পত্তির ভাগাভাগি করতে গিয়ে নিজেদের ফ্ল্যাট বিক্রি করে এখন ভাড়া করা ফ্ল্যাটে থাকে বাপ্পা। সেই ফ্ল্যাটের ভাড়া দিতে হয়, কি করে কি হবে? বাপ্পাকে কিভাবে সান্ত্বনা দেওয়া যায় ভেবে উঠতে পারছেন না অলকা। এ কি মুশকিল নেমে এল সারা দেশে। খবরটা পাওয়ার পর থেকে সমানে কানে ফোন বাপ্পার। বেচারা ছেলেটা, প্রথমে বাবাকে হারাল, তারপর স্ত্রী ছেড়ে গেল এবার কি করবেন অলকা? তাঁর হাতে তো কিছুই নেই। মাথাটা যেন কাজ করছে না। কেমন যেন দম আটকে আসছে। আবার মাথার দিকের জানলাটা খুলে দিলেন অলকা।

সেপ্টেম্বর মাসের নরম ঠান্ডা এক ঝলক হাওয়া ছুঁয়ে গেল তাঁকে। হঠাৎ মনে হল কাল তাহলে যাওয়া হচ্ছে না। কাল না, মানে পরশুও নয়, তার মানে? বুঝতে কয়েক মুহূর্ত সময় লাগল অলকার, অর্থাৎ আপাতত বাপ্পা বা তাঁর ব্যাঙ্গালোর যাওয়া বন্ধ। মনটা খুশিতে যেন উপচে পড়তে লাগল। হাত বাড়িয়েও এই জানলা দিয়ে শিউলি গাছটাকে ছোঁয়া যায় না, গেলে ওকে এখুনি আদর করে দিতেন অলকা। তাড়াতাড়ি ব্যাগ খুলে সুবিমলের ছবিটা বের করে আবার দেওয়ালের খালি জায়গাটায় টাঙ্গিয়ে দিলেন। তারপর সুবিমলের ছবির চিবুকে হাত রেখে এক গাল হেসে বললেন—''এখন আর যাওয়া হচ্ছে না গো''।

২

তিন চার মাস তো হয়ে গেল। বাপ্পা যতটা ভেবেছিল অতটা ক্ষতিও হয়নি। এ বাড়িতে দিলীপ আর আভা তো আছেই। ওদিকে বাপ্পাও এখন কলকাতার বাড়ি থেকে ল্যাপটপে সারাদিন কাজ করছে, ঘাড় তোলার সময় নেই। মাইনে নাকি কিছুটা কম পাচ্ছে, সেটা ঠিক, কিন্তু কাজটা আছে সেটাই বড় ব্যাপার। কতজনের তো কাজই বন্ধ হয়ে গেছে। যেমন পাড়ার মেয়ে অনন্যা, আগে একটা ছোটখাট প্রাইভেট কোম্পানীতে কাজ করত কর্মী ছাঁটাই হয়ে তার কাজ চলে গেছে। এখন সে পাড়ারই আরো কিছু কম বয়সী ছেলে মেয়েদের নিয়ে বাড়ি বাড়ি গ্রসারী ডেলিভারির কাজ শুরু করেছে। সিনিয়র সিটিজেনদের জন্যে নানারকম অফারও দিচ্ছে। অলকার খুব সুবিধে হয়েছে জিনিসপত্র আনার জন্যে কাউকে বাইরে যেতে হচ্ছে না। বাপ্পাও বাড়িতে মন দিয়ে কাজ করতে পারছে।

অনন্যার মা-কে চেনেন অলকা। পাড়ার দুর্গাপুজোর প্রচুর কাজ করেন ভদ্রমহিলা। একমাত্র মেয়ের সম্বন্ধ করে খুব ঘটা করে বিয়ে দিয়েছিলেন, কিন্তু ছেলেটির ড্রাগের নেশা ছিল। পরে জানতে পেরে সঙ্গে সঙ্গেই ডিভোর্স করিয়ে নিয়েছিলেন অনন্যার। বেঁচে গেছে মেয়েটা, কিন্তু সেই ঘটনার পর থেকেই অনন্যার বাবা অসুস্থ হয়ে পড়েন। অনন্যাও আর বিয়ে করেনি। ছোটবেলায় একসঙ্গে পুজোর প্যান্ডেলে আড্ডা দিত বাপ্পা, অনন্যা আরো অনেকে, তারপর মাঝখানে সব যোগাযোগ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। এখন আবার দেখা হচ্ছে ওদের। অনন্যা জিনিস পত্র দিতে নিজেই বাড়িতে আসছে, বাপ্পার সঙ্গে কথা-টথাও হচ্ছে। ভালই লাগছে অলকার। খুব খাটিয়ে আছে মেয়েটা।

বাগানে গিয়ে শিউলিফুল কুড়িয়ে কোঁচড়ে তুলছিলেন অলকা। আভা এগিয়ে এসে বলল—মাসিমা আপনি কেন? আমি তুলে দিচ্ছি। অলকা হাত তুলে ওকে বারণ করলেন। দেখতে দেখতে শরৎকাল কাছাকাছি এসেই

গেল। এখন এই গাছপালাদের সঙ্গে সময় কাটাতেই সব থেকে ভাল লাগে। আজ অনন্যা সকাল সকাল এসেছে, দরজায় দাঁড়িয়ে কথা বলছে বাপ্পার সঙ্গে। বাগান থেকে ওদের কথার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। অলকা অপেক্ষা করছেন আরো কিছুদিন যাক, বাপ্পা যদি তাঁকে অনন্যার ব্যাপারে কিছু বলতে চায়, খুব নিশ্চিন্ত লাগবে অলকার। বাকি জীবনটা শান্তিতে 'অবসর' যাপন করতে পারবেন। কোঁচড় ভরা শিউলি নিয়ে বাগান থেকে তাড়াতাড়ি বাড়ির ভেতরের দিকে এগোলেন অলকা। মনে হল ঠাকুরঘরে গিয়ে মা দুর্গার ছবির পায়ে ফুলগুলো এখুনি দিয়ে দিতে হবে, তবেই মা পূরণ করবেন তাঁর মনস্কামনা।

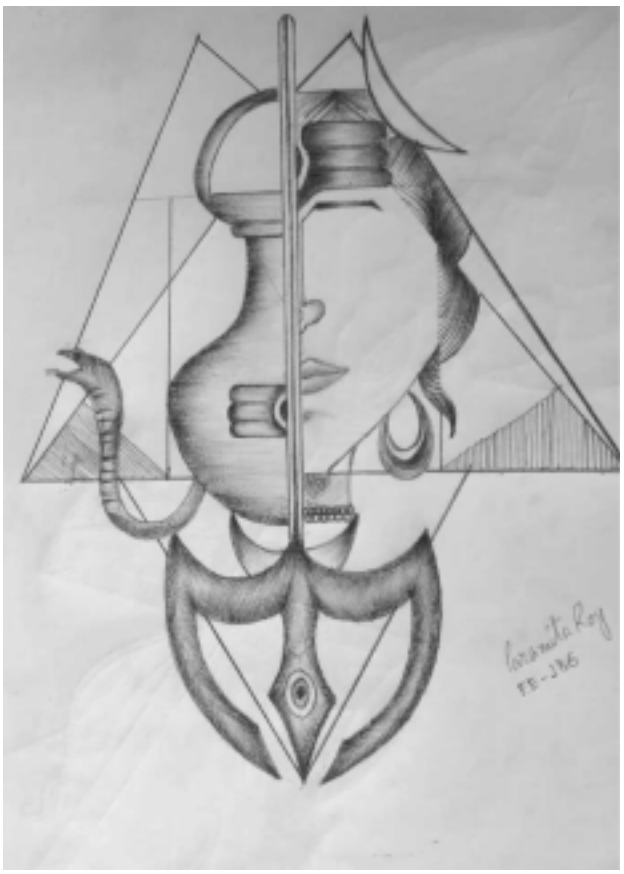

Illustration by Paramita Roy
FE-186

অনলি ফেস মাস্ক করোনা প্যানডেমিক রুখে দিতে পারে

ডা. তুষার কান্তি ঘোষ
এফ ই- ৩৫০

শুধু মাস্ক পরে থাকলেই থমকে যাবে অতিমারী !/ মাস্ক মাস্ট মাস্ট মাস্ট !

সত্যিটা হল, ইএনটি রোগ বিশেষজ্ঞরাই সবচাইতে বেশি করোনা রোগীর চিকিৎসা করেন ! কারণ করোনার প্রধান লক্ষণগুলিই নাক-কান-গলার সমস্যার সঙ্গে সম্পর্কিত। গন্ধ না পাওয়া, মুখে স্বাদ চলে যাওয়া, নাক বন্ধ হয়ে যাওয়া, গলা ব্যথা ও সঙ্গে জ্বর আসা নাক-কান-গলারই অসুখ ! অতএব জ্ঞানত হোক বা অজ্ঞানত---কোভিড রোগীর চিকিৎসা ইএনটি রোগ বিশেষজ্ঞকে করতেই হয়। আমাকেও করতে হয়েছে। অথচ এই দীর্ঘ অতিমারীর মধ্যেও আমরা রোগী দেখা বন্ধ করিনি। বলতে দ্বিধা নেই, প্রতি মুহূর্তেই করোনা ভাইরাসে সংক্রামিত হওয়ার ভয় আমাদের ছিল। কারণ চিকিৎসক হিসেবে রোগীর সঙ্গে দৈহিক দূরত্ব বজায় রাখা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। কারণ নানা আপৎকালীন পরিস্থিতির চিকিৎসাও আমাদের করতে হয়। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, গলায় মাছের কাঁটা গেঁথে গেলে, বড়সড় কোনও বস্তু আটকে গেলে বা কানের পর্দা ফেটে গেলে বা নাকেও কোনও বস্তু ঢুকে গেলে আমাদের রোগীর কাছাকাছি পৌঁছে, এন্ডোস্কোপি করে সেইসমস্ত বস্তু বের করতে হয় ! দিনের পর দিন ধরে রোগীর কোভিড টেস্ট ছাড়াই এবং নানা সময়ে পিপিই ছাড়াই এই ধরনের আপদকালীন পরিস্থিতিতে রোগীকে পরিষেবা আমাদের দিতেই হচ্ছে। আশ্চর্য ব্যাপার হল, তারপরেও বহু ইএনটি বিশেষজ্ঞ করোনা সংক্রমণ এড়াতে পারছেন ! আর এই ঘটনা থেকেই একটা ধারণা ক্রমশ আরও বেশি শক্তপোক্ত হচ্ছে। তা হল; মাস্ক পরে থাকার অভ্যেস রুখে দিতে পারে করোনা সংক্রমণ ! এমনকী রুখতে পারে মহামারীও ! প্রশ্ন হল কীভাবে ? করোনা ভাইরাস মূলত বাসা বাঁধে ন্যাসো ফ্যারিংস এবং ওরো ফ্যারিংস অংশে। অর্থাৎ নাক এবং গলা'র পিছনের অংশে। আর, করোনা ভাইরাস ছড়ায় ড্রপলেটের মাধ্যমে। আমাদের মুখ থেকে বেরিয়ে আসা সূক্ষ্ম জলকণাকে বলে ড্রপলেট। এই ড্রপলেটের মধ্যে থাকে ভাইরাস। কাশলে বা হাঁচলে ড্রপলেটের মাধ্যমে ভাইরাস বেরিয়ে আসে।

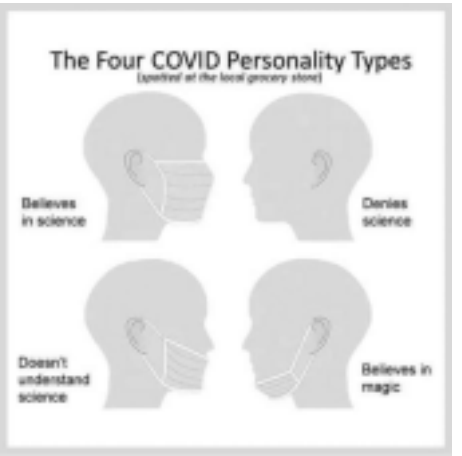

এই প্রসঙ্গে জানিয়ে রাখি, একটি ভাইরাসের আকারের তুলনায় মাস্কে থাকা ছিদ্রের আকার বড়। তা সত্ত্বেও শরীরে ভাইরাসের প্রবেশ আটকে দেয় মাস্ক। কারণ ভাইরাসের আকার খুবই ছোট হলেও, ড্রপলেটের আকার মাস্কের ছিদ্রের চাইতে বড় ! দেখা গিয়েছে ভিড়ের মধ্যে থাকলেও, শুধুমাত্র শক্তভাবে মাস্ক পরে থাকার কারণে বহু মানুষ ভাইরাসের দ্বারা সংক্রামিত হননি ! তা বলে স্যানিটাইজেশন প্রক্রিয়া বন্ধ করলে চলবে না। কারণ শুধুমাত্র হাত ধোওয়ার অভ্যেস করোনা ছাড়াও অন্যান্য ধরনের ব্যাধিকে রুখে দিতে পারে ! অতএব মাস্ক পরুন, কারণ এই মুহূর্তে মাস্কই হল ভাইরাস ও জীবাণুর বিরুদ্ধে সবচাইতে কার্যকরী ভ্যাকসিন।